Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 91–96
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাণী বসুর 'একুশে পা' : একই বয়সের তিন তরুণীর ভিন্ন ভিন্ন জীবনবোধ

পারমিতা চক্রবর্তী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: drparomitachakraborty87@gmail.com

Keyword
জীবন, স্বপ্ন, সংকট, বাস্তব, জটিলতা, একুশে পা

Abstract
বাণী বসুর 'একুশে পা' (১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ) উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে রয়েছে স্কুলজীবন থেকে সদ্য কলেজ জীবনে পা দেওয়া একঝাঁক তরুণ-তরুনীর স্বপ্ন-প্রত্যাশা এবং সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের এক অনন্য আখ্যান। উপন্যাসে বর্ণিত একাধিক চরিত্রের মধ্যে উজ্জয়িনী, ঋতু এবং ইমন, এই তিন চরিত্রের সমবয়সী হয়েও জীবনের সংগ্রাম এবং চাওয়া পাওয়া যে কত ভিন্ন তা উপন্যাসটি আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। এই তিনটি নারীচরিত্র কীভাবে বৃহত্তর জীবনের বৃহত্তর পথে এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পাবে, জীবনের সমস্ত জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে পাবে কি না তার একটি বিশ্লেষণ তাদের ভেতরের এবং বাইরের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

Discussion
বাংলা উপন্যাসের জগতে বাণী বসু প্রভূত জনপ্রিয়তার অধিকারিণী, তিনি তার বিভিন্ন উপন্যাসগুলির মধ্যে নানা পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলোকে নিজস্ব জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই উপন্যাসের চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে জীবন্ত এবং বাস্তবসম্মত। তিনি বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে তিনি গভীর সহমর্মিতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। চেতনা থেকে চেতনায়, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র ও কাহিনী সঞ্চারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং উপলব্ধিকে কেন্দ্র করে জীবনবোধের সার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেন তিনি তার উপন্যাসে, মানুষের বিস্তৃত জীবনকে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে মানব চরিত্রের বৈচিত্রগুলিকে গভীরভাবে অনুধ্যান করেছেন। তাঁর 'একুশে পা' উপন্যাসেও বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা একঝাঁক তরুণ- তরুনীর রুচিবোধ, হৃদয়ের আর্তি, মূল্যবোধ এবং স্বপ্নকে প্রতিফলিত করেছেন। উপন্যাসের তিন নারী চরিত্র- উজ্জয়িনী, ঋতু এবং ইমন কিভাবে নিজেদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে

জীবনের নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে চলার প্রচেষ্টা করে এবং বৃহত্তর জীবনের পথে অগ্রসর হয় তা এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হল।

'একুশে পা' উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রই ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছে। কলেজের বিরাট পরিসরে এসে তারা একসূত্রে মিলিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। ডক্টর রজত মিত্র এবং অমিতা মিত্রের কন্যা উজ্জয়িনী। অর্থ, বৈভব, পরিচিতি কোনো কিছুর অভাব না থাকলেও আছে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনে এক চরম অপ্রাপ্তি, এক অস্তিত্বহীনতা। প্রবল বদরাগী, রুক্ষ মেজাজী বাবা এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন মায়ের মধ্যে সে যেন এক সংযোগরক্ষাকারী সেতু। বাবা, মায়ের সম্পর্কে এক বিশাল দূরত্ব উজ্জয়িনীর জীবনে তৈরি করেছে এক বিশাল শূন্যতা। বাবা রজত মিত্রের একাধিক নারীসঙ্গের বিপরীতে তার মা অমিতা মিত্রের নির্লিপ্ত ব্যবহার এবং এক অব্যক্ত নির্জন যন্ত্রণা ক্রমেই আক্রোশে পরিণত হয়, চরম মানসিক সংঘাতের মধ্যে উজ্জয়িনী মাকে বলতে বাধ্য হয় রূঢ় সত্য –

> *"তুমি সহ্য করছ কেন এসব? আজ শীলা, কাল শর্বরী, পরশু রোজি।তোমরা মনে করো খুব স্থূলভাবে কিছু চোখের ওপর না দেখলে আমি বুঝতে পারব না?আমি এখন বড় হয়েছি, বন্ধু-বান্ধবের একটা সার্কেল আছে আমার। আমি আর কতদিন এভাবে মরমে মরে থাকব? তোমরা একটা কিছু স্থির করো! কিছু একটা করো মা!সক্কলে জানে।তুমি মনে করো কেউ কারো খবর রাখে না? আমার পরিচয় পেলেই লোকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকায় না জানো? আমি আর সহ্য করব না। সহ্য করতে পারছি না।"* [১]

একজন চরিত্রহীন লোকের সঙ্গে কেন তার মা সব সহ্য করে সংসার করছে তা উজ্জয়িনীর কাছে এক বিশাল জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে। শুধুই কী সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাসবহুল জীবন এবং সামাজিক স্ট্যাটাসের জন্য তার মা ডিভোর্স দিতে অনিচ্ছুক এই প্রশ্নও তার মাথায় ঘুরপাক খায়। কিন্তু তার জীবনের গোপন চরম সত্য যখন তার সামনে সহসা উদ্‌ঘাটিত হয় তখন যেন সে অসাড় হয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে যায়। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর উজ্জয়িনী জানতে পারে তার জন্মবৃত্তান্ত, জানতে পারে সে তার মা অমিতা মিত্রের নয়, তার বাবা রজত মিত্র এবং অ্যাংলো নার্স ডোরার কন্যা। ডোরার মৃত্যু হলে নিঃসন্তান অমিতা মিত্র তাকে সন্তানস্নেহে বড় করে তোলে। আর ঠিক এই কারণেই অমিতা মিত্র সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে যাতে কোনোমতেই উজ্জয়িনীকে হারাতে না হয়। বাবার অবৈধ প্রণয়ের সন্তানকে অমিতা মিত্র মাতৃস্নেহে কোলে তুলে নিয়েছেন এই চরম সত্যটি একদিকে যেমন উজ্জয়িনীকে প্রবল অন্তর্ঘাতে জর্জরিত করে দিল তেমনি এমন এক চরম অস্তিত্বের সংকটের মুহূর্তে সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে তার পালনকারী মাকে আঁকড়ে ধরে থাকল। জন্মদাতা বাবার চেয়ে পালনকারী মায়ের ত্যাগ, স্নেহ ভালোবাসা, নির্ভেজাল মাতৃস্নেহ তার কাছে অনেক মূল্যবান বলে মনে হল। প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত উজ্জয়িনীর পুরুষজাতির প্রতি এক নিবিড় নির্মম ঘৃণার বোধ জেগে ওঠে। প্রবল ঘৃণা এবং আক্রোশ থেকে তার অবচেতন মনে জেগে ওঠে পিতার জন্য মৃত্যুকামনা। বাণী বসু এখানে যে তরুণ মনের এক ভিন্ন স্বরূপকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বাবার মৃত্যুই যে তার সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্তির পথ, নিজস্ব সত্ত্বাকে রক্ষা করার একমাত্র পন্থা তা উজ্জয়িনীর তরুণ মনকে কোথাও যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, যার ফলস্বরূপ বাণী বসু এই দিবা স্বপ্নের অবতারণা করেছেন। পরিস্থিতি, সময় এবং বয়সের নিরিখে এই ধরনের ভাবনা লেখিকা যুক্তিযুক্ত ভাবেই তুলে ধরেছেন।

নিদারুন মনঃকষ্ট, দ্বন্দ্ব-জটিলতা এবং দিশা হারানোর এক গভীর যন্ত্রণা নিয়েও ঘুরে দাঁড়িয়েছে উজ্জয়িনী। অহংকারী বলে পরিচিত যে উজ্জয়িনী কখনো পরাজয় স্বীকার করে না সে কলেজের ভোটে রাজেশ্বরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চূড়ান্তভাবে হেরে গিয়ে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারে না। উজ্জয়িনীর মনে হয়-

> *"জীবনের গ্রন্থ থেকে তার একটা একটা করে ছবিঅলা পাতা খসে যাচ্ছে। হারাবার খেলা। হারাবার খেলা শুরু হয়ে গেছে। ক্রমশই ন্যাড়া, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে সব।"* [২]

জীবনের একটা ঘটনা মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে যে মৌলিক প্রশ্নের সামনে জীবনকে দাঁড় করিয়ে দেয়। উজ্জয়িনীরও তাই হয়েছিল। উজ্জয়িনীর মনে হয় তার মা যদি তাকে গ্রহণ না করতেন তাহলে রাস্তায় আজ যে ভিখিরিণী

কাল সে উজ্জয়িনীর জায়গায় ও থাকতে পারত। এই আত্ম-অনুসন্ধান যেন এক ধাক্কায় অনেকটা বড় করে তোলে উজ্জয়িনীকে, তার মনে হয়-

> *"সত্যি! দৈবাৎ, একেবারে দৈবাৎ আমরা আমাদের ভাগ্যটা ভোগ করছি। এভাবে ভোগ করার কোনও অধিকার আমদের নেই রে মিঠু।"* [৩]

ব্যক্তিগত জীবনের এই নিদারুণ অভিঘাত উজ্জয়িনীকে আগাগোড়া বদলে দেয়। যেই উজ্জয়িনী অপমানের জবাব দিতে নিজের পরম প্রিয় বন্ধু রাজেশ্বরীর বিপরীতে কলেজ নির্বাচনে দাঁড়াতে পিছপা হয়নি সেই আজ রাজেশ্বরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। তার মনে হয় তার বন্ধু-বান্ধবেরা কত সুখী, কারণ কারও তার মত লজ্জাকর অতীত কিংবা বর্তমান নেই। তার জীবন সত্যিটা প্রকাশ হলেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে তার এত দিনের মিথ্যে আবরণ। তাকে দেখে হয়তো তার বন্ধুরা মুখ লুকিয়ে লজ্জায় পালিয়ে যাবে। ঘুমহীন রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে উজ্জয়িনী-

> *"সেই উজ্জয়িনী, গর্বিত, অভিমানী, আদুরে, অসহিষ্ণু, সর্দারি করা যায় মজ্জাগত; কথায় কথায় বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া, এই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আবার দুদিন পরেই ভাব, কোনক্রমেই লেখাপড়া বা অন্য কিছুতে গুরুত্ব দিতে শেখাতে পারেননি। সে যেন চিরকাল তার অবস্থানের জোরেই সব কিছু পেয়ে যাবে, তাকে কোনও উদ্যম নিতে হবে না। আজ তাকে চেনা যাচ্ছে না।"* [৪]

যে বাবার জন্য উজ্জয়িনীর জীবনের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব, জটিলতা, অপ্রাপ্তি অস্তিত্বের সংকট সেই ডক্টর রজত মিত্র প্লেন অ্যাকসিডেন্টে দীর্ঘদিন ভোগার পর অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি দিলেন অমিতা মিত্র এবং উজ্জয়িনীকে। রজত মিত্রের সাথে পুড়ে ছাই হয়ে গেল উজ্জয়িনীর জন্মবৃত্তান্ত। জীবনের মাঝখানে এই মৃত্যু যেন সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। এক অদ্ভুত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে উজ্জয়িনীর শরীর এবং মনকে। বিচিত্র সব ভাবনা ঘুরপাক করে তার মাথায়, মৃত্যু যা সততই দুঃক্ষের তা যেনো তার কাছে মুক্তির–

> *"সে ভাবছে, সব মৃত্যুই কি এক? বাইরে থেকে রুক্ষ মলিন বেশ, খালি পা, হবিষ্যান, কিন্তু ভেতরে ? ইমনের বাবাকে সে ইমনের এখনকার মুখ-চোখের আর্ততার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তার মৃত্যু একটা সর্বনাশ। কিন্তু রজত মিত্র যে সময়মতো মারা গিয়ে তাকে বাঁচিয়ে গেছেন। কে যে এই টাইমিংগুলো করে।"* [৫]

উজ্জয়িনীর অন্তরমননের অব্যক্ত কথাই যেনো তার ভাবনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন লেখিকা। সেই অমিতা মিত্রকে যে জীবন উপলব্ধির মধ্য দিয়ে একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে চেয়েছিল সেই আকাঙ্খাই আগাগোড়া বাস্তব রূপ গ্রহণ করে তার সামনে উপস্থিত হয়। মুখের আড়ালে থাকা মুখোশ অনাবৃত্তই থেকে যায়।

মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয়, আহ্লাদ এবং লাগামহীন স্বাধীনতা কীভাবে সদ্য একুশে পা রাখা মেয়ের জীবনকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিতে পারে তা আমরা ঋতুপর্ণার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারি। অজিত দাশ এবং মীনাক্ষী দাশের দুই কন্যা সোমদত্তা এবং ঋতুপর্ণা। সোমদত্তার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ঋতুপর্ণাই বাড়ির সর্বেসর্বা। ছোটমেয়েকে ঠিক বুঝতে পারেন না মিঃ এবং মিসেস দাশ তাই ভয়ও বেশি করেন। ঋতুকে অতিরিক্ত আদর এবং প্রশ্রয় দিতে দিতে সে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার ভয়ানক পরিণামও তার বর্তমান এবং ভবিষ্যত জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। বড়দের নাম ধরে সম্বোধন করা ঋতুর একটি বৈশিট্য। তাই আট বছরের বড় দিদির বর অমিতকেও নাম ধরে ডাকতে সে দ্বিধাবোধ করে না। বাবা মা ফ্রান্সে ট্যুরে গেলে নিজেকে বাড়ির একছত্র অধিকারিণী মনে করে সে হয়ে ওঠে আরও উচ্ছৃঙ্খল এবং অসহিষ্ণু। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে সে ধীরে ধীরে সম্পর্কের মাঝে সূক্ষ্ম সীমারেখাকেও অতিক্রম করে গেছে। সবসময় সবার মনোযোগের কেন্দ্র হতে চাওয়ার এক প্রবল বাসনা তার মনে সবসময় খেলা করত তা সে ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক। অন্তঃস্বত্তা দিদির বরের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দুই বোনের তিক্ত সম্পর্কে আরও দূরত্ব সৃষ্টি করে।

বয়সের এই সন্ধিক্ষণে শরীর এবং মনের চাহিদা যখন উগ্রতায় পরিণত হয় তখন তার স্বরূপ হয় ভয়ঙ্কর। এই ভয়ঙ্কর চাহিদা থেকে সে নিজের জামাইবাবুকেও নিস্তার দেয় না-

> *"অমিত তোমাকে ছাড়া আমার কিচ্ছু ভালো লাগে না, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। অমিত, আমি তোমাকে ভালোবাসি।"* [৬]

অতিরিক্ত স্বাধীনতা কীভাবে তরুণ প্রজন্মকে হীতাহীত জ্ঞানশূন্য করে তোলে তা বাণী বসু ঋতুপর্ণা চরিত্রটির মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। অমিতের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভিমানী ঋতু নিজের আশ্রয় খোঁজে পিতৃসম পার্থপ্রতিম নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে। পার্থপ্রতিমের প্রেমে পড়ে সে তার ঠিকানা খুঁজতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দিনের পর দিন মদ খেয়ে টলতে টলতে সে বাড়ি ফেরে। এভাবেই একদিন সে পার্থপ্রতিমের সন্ধানে বাড়ি থেকে পালিয়ে দিল্লির উদ্দ্যেশে রওনা দেয়। তার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত যে তার জীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে সে বাস্তব জ্ঞানটুকুও তার হয় না। অবশেষে পার্থপ্রতিমের খোঁজ পেলেও তার ডিপ্রেশনের স্টেজ দেখে ভয়ে সাদা হয়ে যায় ঋতু, মুহূর্ত অপেক্ষা না করে পালিয়ে যায় সেখান থেকে। এই পালানো হয়তো তার কোনোদিনও থামবে না, এই পালানো অবিরাম, অন্তহীন। নিজের জীবনের এই সমস্ত ঘটনা থেকে শিখেই ঋতু হয়তো একদিন নিজের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, নৈরাশ্য, অপরিণামদর্শী মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, এই সংকেত বাণী বসু পাঠককে দিতে চেয়েছেন।

মানুষ জীবন অভিজ্ঞতা লাভ করে কখনও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল থেকে দেখে কখনও বা ঠেকে। এই ঠেকে শেখা অনেকসময় হয় বেদনাদায়ক, যা ব্যক্তিজীবনের স্বপ্ন-প্রত্যাশাকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। এমনই এক বেঁচে থাকার স্বপ্ন নিয়ে জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলেজে আসে ইমন। ইমনকে দেখে ছেলে কি মেয়ে বোঝার উপায় নেই। হিলহিলে চেহারা চুলগুলো ছেলেদের মতো ছোট করে কাটা। শান্তস্বভাবের ইমন ভালো টেবিল টেনিস খেলোয়ার। একরাশ স্বপ্ন এবং মনের কোথাও নিজের পারিবারিক, অর্থনৈতিক পরিচয়ের হীনমন্যতা নিয়ে কলকাতার যান্ত্রিক জীবনে তার পা রাখা। যতই খণ্ডিত হোক তার চলা, একটা নিরন্তরতা আছে, প্রবাহমানতা আছে আর সবচেয়ে বেশি আছে অত্বরিত ছন্দময় চলা। অসময়ে বাবার চলে যাওয়া তাকে বয়সের তুলনায় করে তুলেছে অনেক অভিজ্ঞ। মাকেও কাজে বেরোতে হওয়ায় এক পঙ্গু ভাইকে নিয়ে নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বকে সঙ্গী করে সে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বৃত্তি জোগাড় করে। খেলাকে নিজের শক্তি বানিয়ে সে তার সামাজিক গ্লানিটুকু মুছে ফেলতে চায়।

দারিদ্রতার কুণ্ঠাবোধ থেকে ইমন যেন কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুনলেই সে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তার সম্ভ্রান্ত পরিবারের বন্ধুরা যদি তার অর্থনৈতিক অবস্থানের নিরিখে তার মায়ের দিকে সম্মানহীন দৃষ্টিতে তাকায় তা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। তাই অন্তরঙ্গতা থেকে দূরে একা থাকাকেই সে শ্রেয় বলে মনে করে-

> *"নিষ্ঠুর দাম্ভিক, এই শহর, সে জানে। কিন্তু তার মা যে তার মা-ই। তার সমস্ত ছেলেবেলা, আনন্দ, ভালোবাসার কেন্দ্র, তার পঙ্গু ভাইটি আর তার মা, আর তার অকালমৃত বাবা, যিনি হাসপাতালের ক্লার্ক ছিলেন। কী কঠোর দারিদ্রে তাদের দিন কাটছে। এরা এইসব ফর্সা, চুল কাটা, লিপস্টিক মাখা মেয়েরা সেসব কল্পনাও করতে পারবে না।"* [৭]

তাই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকে ইমন।

ইমনের সন্তর্পণে আগলানো ব্যক্তিজীবনের এই নির্জন যন্ত্রণা হঠাৎই তার রূঢ় রূপ নিয়ে তার বন্ধু মিঠুর সামনে ধরা পড়ে যখন মিঠুর দাদা সুহাস ইমনের কাছে উপস্থিত হয় অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। এই সময়ে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব এবং দোলাচলতা ইমনের মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে হারাতে না চাওয়ায় ইমনের মা স্পষ্টই আপত্তি জানিয়ে দেয় অনুরাধার আনা প্রস্তাবে। তাদের তিনজনের জীবনে মিঠুর পরিবারের এই অনধিকার প্রবেশ ইমনকেও করে তোলে আড়ষ্ট এবং অস্বচ্ছন্দ। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকে তুচ্ছ করে নিজের মনকে প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জয় করে সে অবিচল থাকে নিজের লক্ষ্যে।

এই সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন ইমনের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপের মাঠে সুহাসকে দেখে এক অদ্ভুত রকমের স্নায়ুবিপর্যয় হয়। শিরদাঁড়া দিয়ে অজানা এক গরম স্রোত নামতে থাকে, মুহূর্তের এই দুর্বলতাকে একনিমিষে মন থেকে মুছে নিজের লক্ষ্য অবিচল রাখে ইমন-

> *"সুহাসকে দেখে যখন তার আবার পিঠ গরম হতে শুরু করল, ইমন মনে মনে নিজেকে একটা কষে থাপ্পড় দিল। ওই ছেলেটি তোমার খেলা নষ্ট করে দেবে? এত ঠুনকো তোমার মনোযোগ ইমন? ছি!"* [৮]

মা এবং ভাইয়ের দায়িত্ব সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করাই তার জীবনের একমাত্র অগ্রাধিকার যেখানে অন্য কোনো রকম সুখ-স্বপ্নের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিজের চারিদিকে তৈরি করা এই গণ্ডী অতিক্রম করা যে তার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব নয় তা সুহাসকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় ইমন-

> *"ভাববেন না কোনও কমপ্লেক্স থেকে, একটু কমপ্লেক্স হয়তো আছেই, কিন্তু আমি দেখি এক সমাজের মধ্যে নানান সামাজিক গণ্ডী। শুধু হ্যাভস-হ্যাভস নটদের নয়। উচ্চশিক্ষিত, মধ্যশিক্ষিত, বড় চাকুরে, ছোট চাকুরে, সরকারি চাকুরে, কমার্শিয়াল ফার্মের চাকুরে, সব আলাদা আলাদা সামাজিক গণ্ডী। আমি আমার মাকে কোনরকম অসম্মানের মধ্যে ফেলতে চাই না। এমন কোনও পরিস্থিতি যাতে মা কুঁকড়ে যাবে, নিজেকে ছোট মনে করবে।"* [৯]

তাই বিয়ের কথা ভাবা তার কাছে বিলাসিতা। মা এবং ভাইকে শহরে এনে ভাইয়ের চিকিৎসা এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা করা তার একমাত্র পাথেয়। তাকে সেই লক্ষ্যে যেতে হবে অনেক অনেক দূর।

ইমন হোস্টেলের ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবে তার মাকে সামাজিক হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা। তার মাকে বাবার মৃত্যুর পর যে লড়াই করতে হয়েছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অসম্মানের বিরুদ্ধে, ধীরে ধীরে বস্তিজীবনের দিকে নেমে যাওয়ার বিরুদ্ধে; এই সমস্ত তুচ্ছতা, হতাশার গ্লানি থেকে সে কী সত্যিই পারবে তার মায়ের মনকে মুক্ত করতে। ইমন নিজেও এতদিনে এই হীনমন্যতার গণ্ডি পেরতে পারেনি, পারেনি মুক্তির স্বাদ নিতে, তাহলে মা কী করে পারবে এই ভাবনায় আচ্ছন্ন হয় ইমনের অন্তর্নিহিত সত্তা। দারুন কঠিন মনসংযোগ নিয়ে নিজের মনকে সে বোঝায়–

> *"আরও কত দূর যেতে হবে তাকে! অনেক পাহাড় পার হয়েও সে যদি দেখে আরও পাহাড়, আরও পথ! সে সব পার হয়েও, যদি থাকে আরো আরো!"* [১০]

এই স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে থাকে ইমন, বেঁচে থাক ইমন, বেঁচে থাকে ইমনের মতো আরও অসংখ্য সংগ্রামী মেয়ে এক বৃহত্তর কর্মদ্যমের প্রচেষ্টা নিয়ে।

উজ্জয়িনী, ঋতু এবং ইমন তিনজন একই বয়সি হলেও তাদের জীবন সংগ্রাম এবং স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার বিশাল এক তফাৎ লক্ষণীয়। একই প্রজন্মের এই ভিন্ন ভিন্ন মানসিক অভিব্যক্তিকে বাণী বসু অত্যন্ত সমাজ-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছেন। কখনও ব্যক্তিগত জীবনে পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙাগড়া, কখনও অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারীতা আবার কখনও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জীবন যুদ্ধ এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নিজেদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই তারা এগিয়ে গেছে ভবিষ্যতের পথে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনবোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাদের নিজস্ব ভাবনা।

তথ্যসূত্র :

১। বসু, বাণী, 'একুশে পা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১৪, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৪, চতুর্দশ মুদ্রণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯
২। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৭
৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৬৮
৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৮০
৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৫
৬। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬
৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৮৩

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ১১৮
৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১২১
১০। তদেব, পৃষ্ঠা ১২২

সহায়ক গ্রন্থ :

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'নারীচেতনার মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ২০০৭
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার,'কালের প্রতিমা-বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর ১৯২৩-১৯৯৭', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০০, পুনমুদ্রণ, এপ্রিল ২০১০
৩. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০, পুনমুদ্রণ এপ্রিল ২০১৫
৪. বসু, রাজশেখর, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত; সারানুবাদ', এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩,
৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পাদিত), 'কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক', আশাদীপ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪
৬. বন্দোপাধ্যায়, সরোজ, 'বাংলা উপান্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, ষষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২